কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৪৬ ❑ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ❑ ২০১৩ খ্রি. ❑ ১৭ ভাদ্র-১৬ কার্তিক ❑ ১৪২০ বঙ্গাব্দ ❑ পৃষ্ঠা ২০

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

সম্পাদকীয়

১৬ অক্টোবর ২০১৩ বিশ্ব খাদ্য দিবস। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও প্রতিবছর এই দিবসটি যথাযথভাবে পালিত হয়ে আসছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ২৪ অক্টোবর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে খাদ্য দিবস উপলক্ষে সেমিনার ও মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল "খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির জন্য চাই টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা"। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্যের নিরাপত্তা বিধান, পুষ্টিমানের উন্নয়ন, কৃষিপণ্য বিপনন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ কৃষির একটি বড় চ্যালেঞ্জ। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে কৃষি উপকরণ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এজন্য বিএডিসি'র বীজের সরবরাহসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। "যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন, আমরা আছি তাদের জন্য" এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিএডিসি ক্ষুধা জয়ের নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের কৃষি উন্নয়নের লক্ষে মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সরবরাহ, উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও নার্সারী স্থাপন, প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান, দরিদ্র কৃষকদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, জনসচেতনতা ও পুষ্টিমান বৃদ্ধির পাশাপাশি আধুনিক কৃষি ও সেচ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য শস্য উৎপাদনই বিএডিসি'র একমাত্র লক্ষ্য।

খাদ্য মেলা ২০১৩ উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টল

স্টলে প্রদর্শিত বিএডিসি'র উৎপাদিত নেরিকা ধান

ভেতরের পাতায়.....

আগামী দিনে আমরা সবার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের নিশ্চয়তা দিব- কৃষিমন্ত্রী.....০৩

বিএডিসি'র ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার উন্মোচিত হয়েছে সেচ সম্প্রসারণের নতুন দুয়ার.....০৯

কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে কুমিলা জেলায় বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রম.....১০

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে বীজ ডিলার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত.....১১

কৃষি উন্নয়নে সরকারের সফলতা এবং বিএডিসি'র পুনর্গঠন.....১৩

অগ্রহায়ণ – পৌষ মাসের কৃষি.....১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

তত্ত্বাবধানে ঃ জনসংযোগ কর্মকর্তা- তাহমিনা বেগম, সম্পাদক- মোঃ তোফায়েল আহমদ, ফটোগ্রাফি- মোঃ আব্দুল মাজেদ, মুদ্রণে- প্রিন্টলাইন

আগামী দিনে আমরা সবার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের নিশ্চয়তা দিব- কৃষিমন্ত্রী

আগামী দিনে আমরা মানুষের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের নিশ্চয়তা দিব। সবাই স্বাস্থ্য সচেতন হোন, পুষ্টিকর খাবার খান। আসুন আমরা সবাই আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

খাদ্য মেলায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

গত ২৪ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও মেলার উদ্বোধনী বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, তিন দিন যাবত খাদ্য মেলা হবে। যা দেখে ঢাকায় জনগণ পুষ্টিজ্ঞান লাভ করবে। গ্রামের সাধারণ মানুষ পুষ্টি নিয়ে ভাবে যেটা আগে সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য ছিলনা। পুষ্টি নিয়ে গবেষণার জন্য ৮০ একর জমির উপর পুষ্টি ইনস্টিটিউট হবে। বর্তমানে দেশে শাক সবজি উৎপাদন বেড়েছে। সারা বছর শাক সবজি উৎপাদন হচ্ছে। শাক সবজি উৎপাদন করে আমরা তা ইউরোপিয়ান মার্কেটে রপ্তানি করতে পারব।

খাদ্য মেলা ২০১৩ উপলক্ষে স্থাপিত বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইংয়ের মহাপরিচালক জনাব আনোয়ার ফারুক, সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

কৃষিমন্ত্রী বলেন, ১৯৪৫ সালের ১৬ অক্টোবর এফএও এর জন্ম সময় উলেখ করে সারা বিশ্বে খাদ্য দিবস পালিত হয়। বর্তমান বিশ্বের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে দিবসটি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে আমরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছি।

এবারের খাদ্য দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির জন্য চাই টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা।" সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী আঃ রাজ্জাক এমপি। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ওয়ায়েস কবীর, এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি মাইক রবসন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইংয়ের মহা পরিচালক জনাব আনোয়ার ফারুক। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এফএও এর ন্যাশনাল ফিজিক্যাল এন্ড সোসাল একসেস এ্যাডভাইজার অধ্যাপক রেজাউল করিম তালুকদার।

বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ পাজা থেকে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। খাদ্য মেলায় বিএডিসি সহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি ও বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ স্টল পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ বিএডিসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

খাদ্য মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি, সদস্য পরিচালকবৃন্দ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

খাদ্য মেলায় বিএডিসি'র স্টলে রাবার ড্যামের মডেল পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আবদুস সামাদ ও সচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

খাদ্য মেলা ২০১৩ উপলক্ষে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের র‍্যালী

পদোন্নতি

● জনসংযোগ কর্মকর্তা, জনসংযোগ বিভাগ বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত জনাব মেরিনা সারমীনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক প্রধান (মনিটরিং) পদে বিএডিসি, কৃষিভবন ঢাকায় পদস্থ/স্থানাপন্ন করা হয়েছে।

● যুগ্মসচিব (সংস্থাপন) ও যুগ্মসচিব (নিওক) এর অতিরিক্ত দায়িত্বে বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত ড. মোলা আজফারুল হককে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক প্রধান (পরিকল্পনা) পদে বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় পদস্থ/স্থানাপন্ন করা হয়েছে।

বিএডিসি'র রবি মৌসুমে ৭২৫০ গ্রাম প্রকৃত আলু বীজ (টিপিএস) বরাদ্দসূচি

২০১৩-১৪ সালের রবি মৌসুমে বিতরণের জন্য বারি টিপিএস/১১৬৭, ৩৬৪/৬৭ ও ৭/৬৭ জাতের ৭২৫০ গ্রাম প্রকৃত আলু বীজ (টিপিএস) সংরক্ষিত আছে। উক্ত মজুদের উপর ভিত্তি করে বীজ ডিলার ও কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য নিম্নবর্ণিত অঞ্চলসমূহের পার্শ্বে বর্ণিত পরিমাণ প্রকৃত আলু বীজ (টিপিএস) বরাদ্দ দেয়া হলো

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (গ্রাম)
১	ঢাকা	৫০০
২	ময়মনসিংহ	৬০
৩	জামালপুর	২৭০
৪	কিশোরগঞ্জ	২৫০
৫	টাঙ্গাইল	৫০
৬	ফরিদপুর	৩৮০
৭	কুমিল্লা	৫৪০
৮	রাজশাহী	৯৮০
৯	বগুড়া	৮৭০
১০	রংপুর	১৩৩০
১১	দিনাজপুর	৯৮০
১২	খুলনা	৫০
১৩	যশোর	৫৫০
১৪	কুষ্টিয়া	৪৪০
	সর্বমোট ঃ	৭২৫০

শোক সংবাদ

● উপপরিচালক (বীউ), ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন কেন্দ্র, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গা দপ্তরে কর্মরত ক্যাশিয়ার জনাব মোঃ ওয়াহেদ আলী গত ৩১-১০-২০১৩ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন।)

● সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ/জ এবং প) এর দপ্তর, বিএডিসি, রাজশাহী জোনের আওতাধীন চাঁপাই নবাবগঞ্জ (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিট এর বিপরীতে নাটোর রিজিয়ন দপ্তরে কর্মরত সহকারী মেকানিক জনাব রফিকুল ইসলাম গত ২৮-১০-২০১৩ ইং তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন।)

● সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয়, বিএডিসি, গাজীপুর রিজিয়নের অন্তর্গত কালীগঞ্জ (ক্ষুদ্রসেচ) জোনের কর্মরত সহকারী মেকানিক জনাব মোঃ ওমর আলী গত ২০-০৯-২০১৩ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন।)

● যুগ্মপরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা), রাজশাহী দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সহকারী পরিচালক (সার) বিএডিসি রাজশাহী দপ্তরের দারোয়ান যুগ্মপরিচালক (সার) বিএডিসি, রংপুর দপ্তরে আযুক্ত) জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী গত ১৫-০৯-২০১৩ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন।)

● সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/পানাসি) এর দপ্তর বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ/পানাসি প্রকল্প রায়গঞ্জ জোন, সিরাজগঞ্জ এর গাড়ী চালক জনাব আব্দুস সামাদ গত ২৫-০৮-২০১৩ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)

● সহকারী প্রকৌশলী (সওকা), বিএডিসি সিলেট জোন, সিলেট এর দপ্তরে কর্মরত ফিটার জনাব মোঃ মকবুল আলী গত ১৭-১০-২০১৩ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন।)

ধান চাষের "ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তি"

(১৭ এর পাতা এর পর)

আমদানী নির্ভর বিদেশী কিছু তরল সার বিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে তরল সার প্রধানত Additional Supplemental Food হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাসায়নিক সার নির্ভর উচ্চফলনশীল বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদের নিবিড়তা বৃদ্ধির কারণে আমাদের দেশের কৃষি জমি বিভিন্ন অনুখাদ্যের অভাব এবং বিষাক্ততার প্রভাবে তার উর্বরতা এবং উৎপাদনশীলতা দিনে দিনে হারিয় ফেলছে। এ ছাড়া চাষিরা বেশি ফসল উৎপাদনের আশায় আরও অধিক পরিমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করছেন ফলে ক্ষতির মাত্রা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উলেখ্য ধানের জমিতে ইউরিয়া সার যখন মাটিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হয় তখন তার মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ কাজে লাগে অবশিষ্ট ৭০ শতাংশ অপচয় হয় বলে আমাদের দেশের সম্মানিত ধান বিজ্ঞানীদের নিকট থেকেই জানা যায়। বর্তমান সময়ে বিশ্ব খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা (FAO) মাটি এবং পরিবেশের দূষণের মাত্রা কমিয়ে ফসল উৎপাদনের বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছে এবং Save and Grow নামক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি ফসল উৎপাদনে সর্বনিম্ন কৃষি উপকরণের ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ফসল ফলানো।

প্রযুক্তির প্রয়োগ কৌশল ঃ পাতার মাধ্যমে গাছকে খাদ্য প্রদানের বিষয়টি নিয়ে শখের বসে দীর্ঘ ২২ বছর গবেষণা করে ধান চাষের একটি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছি। এই প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে একটি তরল সার ব্যবহার করছি যা আমি নিজে উদ্ভাবন করেছি (বাংলাদেশে প্রথম উদ্ভাবিত মিশ্র তরল সার) এবং এর নাম দিয়েছি "ম্যাজিক গ্রোথ"। এজন্য ধান চাষের এই প্রযুক্তিটিকে "ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তি" বলে আখ্যায়িত করেছি। উদ্ভাবিত ধান চাষের ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের প্রায়োগিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ধান চাষে উলেখযোগ্য পরিমাণে ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমে যাচ্ছে পাশাপাশি ধানের ফলনও বেশি হচ্ছে। তরল সার ম্যাজিক গ্রোথের মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টসহ অন্যান্য ম্যাক্রো-নিউট্রিয়েন্ট গাছকে অতিমাত্রায় সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান করছে আর প্রতি লিটার পানিতে যে অতিরিক্ত ২০.০০ গ্রাম ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হচ্ছে তা ধান গাছের নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণ করছে {ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তিতে ধান চাষে শতকরা ৫০ ভাগ ইউরিয়ারা মাটিতে এবং শতকরা ১০ ভাগ ইউরিয়া (২% দ্রবণ) ও প্রতি লিটার পানিতে ৬.২৫ গ্রাম পটাশ (০.৬২৫%) ম্যাজিক গ্রোথের সাথে পানিতে (প্রতি লিটারে ২.০ মিলি ম্যাজিক গ্রোথ) মিশিয়ে স্প্রে করা হয়, এক হেক্টর জমির ধান চাষে তিনবারে মোট ১২০০ লিটার দ্রবণের প্রয়োজন হয়}। এই প্রযুক্তিতে ইউরিয়া সারের ব্যবহার প্রায় ৪০% কমে গেলেও প্রকৃতপক্ষে ধান চাষে নাইট্রোজেনের ব্যবহার কমে না। কারণ পাতার মাধ্যমে যখন ইউরিয়া প্রদান করা হয় তখন তার কার্যকরিতা অনেক গুন বেশি বৃদ্ধি পায়। এটিই ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তির মাধ্যমে ধান চাষের মূল কৌশল। বিষয়টির মধ্যে সম্পূর্ণ আধুনিক বিজ্ঞান রয়েছে। বিএডিসিতে কর্মকালীন মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় বিষয়টি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছি এবং জাতির নিকট উপস্থাপন করেছি। আমার উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি বিশ্ব খাদ্য এবং কৃষি সংস্থার (FAO) এর Save and Grow ধারণাটিকেও অনুসরণ করছে।

গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিষয় ঃ একটি গাছের ১০০ ভাগ শুষ্ক পদার্থ তৈরিতে ১৬টি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যোপাদানের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দ্বারা শতকরা ৯৬ ভাগ তৈরি হয় যা গাছ সম্পূর্ণ প্রকৃতি থেকে (পানি এবং বাতাস) পেয়ে থাকে। অবশিষ্ট শতকরা ৪ ভাগের মধ্যে ২.৭ ভাগ তৈরি হয় অত্যাবশ্যকীয় প্রাইমারী খনিজ খাদ্য উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশের মাধ্যমে। ০.৫০ ভাগ তৈরী হয় অত্যাবশ্যকীয় সেকেন্ডরী খনিজ খাদ্য উপাদান ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং সালফারের দ্বারা। অবশিষ্ট ০.৮ ভাগ তৈরি হয় অবশিষ্ট ৭টি মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টের মাধ্যমে। সুতরাং আমরা যদি সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ইউরিয়া সারকে ধান চাষে মাটিতে এবং পাতার মাধ্যমে ব্যবহার করে গাছের পুষ্টির/নাইট্রোজেনের চাহিদার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারি তা হলে অল্প পরিমাণ সারের ব্যবহারের মাধ্যমেই কাঙ্খিত ফলন পাওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত ফলাফল সেটাই নির্দেশ করছে। বিষয়টি আমাদের কৃষি অর্থনীতিতে বড় ধরণের সুফল বয়ে আনবে বলে মনে করি।

প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে যে লাভ হবে ঃ

ধান চাষে ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করলে যে সকল সুবিধা পাওয়া যাবে, তা সংক্ষেপে নীচে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় (তীব্রশীত, খরা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা) ধান উৎপাদনে অধিক সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২। ধান চাষে ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমে যাবে প্রায় ৪০% এবং ধানের উৎপাদন বাড়বে ২০% পর্যন্ত ফলে সামগ্রীক ভাবে ধান উৎপাদন ব্যয় কমে যাবে বলে কৃষক সরাসরি লাভবান হবে। উৎপাদিত ধানের গুনগত মান ভালো হওয়ার কারণে কৃষক বাজারে তার ধান কিছু বেশী দামে বিক্রয় করতে পারবে।

৩। ইউরিয়া সারের আমদানি কমে যাবে ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। পাশাপাশি সরকারি ভর্তুকি প্রদান হ্রাস পাবে।

৪। দেশের বিদ্যুতের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হবে। যেহেতু ইউরিয়া তৈরির কাঁচামাল গ্যাসের ব্যবহার কমে যাবে ফলে ঐ গ্যাস ব্যবহার করে অতিরিক্ত বিদ্যুত উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

৫। গ্যাসের প্রাপ্তি বৃদ্ধির কারণে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। বাসা বাড়ি এবং নতুন নতুন শিল্প কারখানাতে গ্যাস সংযোগ দেওয়া সম্ভব হবে।

চলবে.....

হাওরের আগাম বন্যা এড়ানোর নতুন সম্ভাবনা বিএডিসির নতুন উদ্ভাবন 'সুপার হাইব্রিড' ধান

দেশের অন্যতম বোরো উৎপাদকারী এলাকা কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং ব্রাহ্মনবাড়িয়ার হাওরাঞ্চল। কিন্তু প্রায় প্রতি বছরই এসব হাওরে লাখ লাখ হেক্টর পাকা এবং আধাপাকা বোরো ধান আগাম বন্যা বা পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। প্রায়ই পুরো হাওরের সমুদয় ধান বানের পানিতে তলিয়ে গিয়ে একদিকে যেমন দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিপন্ন করে তোলে, অন্যদিকে কৃষকদেরও পথে বসিয়ে দেয়। ফলে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগটি বহু বছর ধরেই কৃষক, সরকার এবং কৃষি বিভাগের মাথাব্যথার কারণ হিসেবে বিরাজ করছিল। সেই দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণের জন্য এবার বিএডিসির উৎপাদিত স্বল্প জীবনকালের 'আগাম জাতের সুপার হাইব্রিড' ধান নতুন সম্ভাবনা জাগিয়েছে। এই ধানটি হাওরে আবাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এটির ফলন হবে বাজারে প্রচলিত সব জাতের হাইব্রিড ধানের চেয়ে বেশি। সুপার হাইব্রিডের ফলন হয় প্রতি একরে ১২০ থেকে ১৪০ মন পর্যন্ত, যা দেশে প্রচলিত সব প্রাইভেট কোম্পানির হাইব্রিডের চেয়েও বেশি।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপপরিচালক নির্মল কুমার সাহা এবং বিএডিসি (বীজ বিপণন) উপপরিচালক ড. সুলতানুল আলম জানান, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী চীন থেকে এসএল-৮এইচ (শিং লিয়ন-৮ হাইব্রিড) ধানের মাতৃ ও পিতৃবীজের কিছু নমুনা নিয়ে এসে বিএডিসির হাতে তুলে দিয়েছিলেন গবেষণা করে আমাদের দেশের উপযোগী জাত উদ্ভাবনের জন্য। দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় দেশের ২৬টি খামারে বীজতলা তৈরি করে এর থেকে কৃষক পর্যায়ে বিপণনে উপযোগী বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম হন। কৃষি বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'বিএডিসি সুপার হাইব্রিড'। কৃষি কর্মকর্তারা জানান, এই ধান আবাদ করলে একদিকে যেমন পাহাড়ি ঢলের আগেই ধান কাটা হয়ে যাবে, অন্যদিকে চৈত্র মাসে দেশব্যাপী যে খাদ্য সংকট দেখা দেয়, সেই সংকট মোকাবিলাও সম্ভব হবে। দুই কৃষি কর্মকর্তা জানান, এই ধানের জীবনকাল মাত্র ১৩০ থেকে ১৩৫ দিন। অথচ আগাম জাতের উচ্চ ফলনশীল ব্রি-২৮ ধানের জীবনকাল ১৪০ দিন এবং ব্রি ২৯ ধানের জীবনকাল ১৬৫ দিন। ব্রি-২৮ ধান একরে উৎপন্ন হয় ৫৫ থেকে ৬০ মণ, আর ব্রি-২৯ উৎপন্ন হয় ৭৫ থেকে ৯০ মণ। অন্যদিকে সুপার হাইব্রিড উৎপন্ন হয় একরে ১২০ থেকে ১৪০ মণ পর্যন্ত। এছাড়া, সুপার হাইব্রিড অবিকল ব্রি-২৮ ধানের মতো চিকন এবং চালও একই রকম। এর ভাতও বেশ সুস্বাদু বলে কৃষি কর্মকর্তারা জানান। আর পাঁচ কেজি বীজে এক একর জমি আবাদ করা যায়।

কৃষি কর্মকর্তারা বলেন, এই ধানের জমিতে সব সময় জমানো পানি রাখতে হয় না। মাঝে মাঝে জমিকে শুকিয়ে ফেলে আবার নতুন করে সেচ দিলে ফলন ভালো হয়। আর পরিণত ধান ৮০ থেকে ৯০ ভাগ পাকার সঙ্গে সঙ্গে কেটে ফেলতে হবে। কারণ বেশি পেকে গেলে ধানের বোটা নরম হয়ে অনেক ধান ঝরে পড়ে। তখন কৃষকদের ভুল ধারণা হতে পারে যে এই ধানে কর্মকর্তাদের বর্ণনা মতো ফলন হয় না। শুধু হাইব্রিড নয়, যে কোন ধান ৯০ ভাগ পাকতেই কাটার নিয়ম বলে কৃষি কর্মকর্তারা জানান। মিঠামইনের কাটখাল বকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান এ প্রতিনিধিকে জানান, তিনি গত মৌসুমে কাটখালের কৃষক ফুল মিয়াকে দিয়ে এক একর জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে সুপার হাইব্রিড আবাদ করিয়ে শুকিয়ে ১০৭ মণ ধান পেয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যথাযথ তদারকির মাধ্যমে আরও বেশি ধান ফলানো সম্ভব বলে তিনি আশাবাদী।

বিএডিসির ডিলারের মাধ্যমে সুপার হাইব্রিডের বীজ বিপণন করা হচ্ছে। প্রতি কেজি বীজের দাম রাখা হয়েছে ১৯০ টাকা। অথচ বাজারে অন্য প্রাইভেট কোম্পানির বীজ বিক্রি হচ্ছে সাড়ে ৩শ টাকা কেজি পর্যন্ত। ফলে সুপার হাইব্রিড বীজ কেনা থেকে সেচ পর্যন্ত পুরো আবাদ প্রক্রিয়াটিই আর্থিকভাবে বেশ সাশ্রয়ী। আর সর্বাধিক ফলন তো আছেই। সার এবং কীটনাশকও তুলনামূলক কম খরচ হয়।

এই সুপার হাইব্রিড ধান জেলার হাওর এলাকায় আবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে উপপরিচালক নির্মল কুমার সাহা, ড. সুলতানুল আলম এবং উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত কুমার সাহা দুর্গম হাওরে ছুটে বেড়াচ্ছেন। তারা এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন, কৃষি কর্মকর্তা এবং ডিলারদের মধ্যে ধারণা দেয়ার জন্য রোববার গিয়েছিলেন হাওর এলাকা ইটনা ও মিঠামইনে। সেখানে মিঠামইনের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদেকুর রহমান, ইটনার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবায়দুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জামাল উদ্দিন, মিঠামইনের কৃষি কর্মকর্তা শাহীদুল ইসলাম, বিভিন্ন বকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং সার ও বীজ ডিলাররা উপস্থিত ছিলেন। কৃষি কর্মকর্তারা জানান, আগামী বোরো মৌসুমে ইটনার জন্য আট মেট্রিক টন, মিঠামইন ও অষ্টগ্রামের জন্য ছয় মেট্রিক টন করে সুপার হাইব্রিডের বীজ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তারা বলেন, বিপদসঙ্কুল হাওর এলাকায় বোরোই একমাত্র ধান ফসল। কাজেই উচ্চ ফলনশীল এবং স্বল্প জীবনকালের বিবেচনায় হাওরবাসীকে সব প্রকার দ্বিধা ভুলে গিয়ে সুপার হাইব্রিডের আবাদে অভ্যস্ত হতে হবে। আর এই সুপার হাইব্রিড কৃষকদের সামগ্রিক উন্নয়নে একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে বলে কৃষি কর্মকর্তারা জানান। আগামী বোরো মৌসুমে কিশোরগঞ্জ জেলার জন্য পাঁচ মেট্রিক টন এবং নেত্রকোনা জেলার জন্য ৪০ মেট্রিক টন সুপার হাইব্রিড বীজ বরাদ্দ করা হয়েছে বলে দুই জেলার দায়িত্বে থাকা উপপরিচালক ড. সুলতানুল আলম জানিয়েছেন।

সংকলিত ঃ দৈনিক সংবাদ

০৮-১০-২০১৩

পাবনায় হাইব্রিড ধান এসএল-৮ এইচ বীজ উৎপাদনে সাফল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন পাবনার টেবুনিয়া কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষিরা এসএল-৮ এইচ জাতের সুপার হাইব্রিড ধানের (এফওয়ান) বীজ উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছেন। চীন থেকে আমদানি করা উচ্চ ফলনশীল এই বীজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আরো দ্বিগুন ফলনশীল করা সম্ভব হয়েছে।

সংশিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) ২০১১-১৩ অর্থবছরে বোরো উৎপাদন বর্ষে সারাদেশে ১ হাজার ৭৩২.৫ একর জমিতে ১ হাজার ৩৮৬ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় পাবনার টেবুনিয়া কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনে ৫০ একর জমিতে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে এসএল-৮ এইচ জাতের সুপার হাইব্রিড ধানের (এফওয়ান) বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪ হাজার মেট্রিক টন। সূত্র জানায়, টেবুনিয়া কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ৫টি স্কিমে এসএল-৮ এইচ জাতের সুপার হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদনের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা একরপ্রতি ৮০০ কেজি থাকলেও বিএডিসি কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ এবং চাষিদের যথাযথ পরিচর্যায় পশ্চিম বনগ্রাম বকের ১৩ একর জমিতে গড়ে একরপ্রতি ১ হাজার ৭২ কেজি হাইব্রিড বীজ উৎপাদন হয়েছে। এ ছাড়াও মির্জাপুর দিকশাইল স্কিমে কৃষক আবদুল খালেক একরপ্রতি ১ হাজার ৩৯০ কেজি, মোসলেম মাস্টারের জমিতে একরপ্রতি গড়ে ১ হাজার ৮০১ কেজি বীজ উৎপাদন হয়েছে। চলতি বছর টেবুনিয়া জোনের চুক্তিবদ্ধ এসব চাষিদের আবাদ পদ্ধতি দেখতে মাঠ পরিদর্শন করেন চীনের হাইব্রিড ধান বিশেষজ্ঞ জিয়াং সু গুহ্ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর এবং সংস্থার কর্মকর্তারা। তারা মাঠ পরিদর্শন করে সাফল্যের জন্য কৃষক ও বিএডিসি কর্মকর্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

টেবুনিয়া কন্ট্রাক্ট জোনের উপপরিচালক কৃষি বিজ্ঞানী আনন্দ চন্দ্র দাস জানান, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫০০-৬০০ কেজি অতিরিক্ত বীজ উৎপাদন হয়েছে। হাইব্রিড বা শঙ্কর ধান বীজ (এফওয়ান) উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকরা এবার রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। কেননা, স্বাভাবিক নিয়মে হাইব্রিড ধানের একরপ্রতি গড় ফলন প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতগুলোর চাইতে শতকরা ২০-২৫ ভাগ বেশি হওয়ার কথা, কিন্তু এসএল-৮ এইচ জাতের হাইব্রিড ধানের গড় ফলন প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতগুলোর প্রায় দ্বিগুনের কাছাকাছি।

সংকলিত : দৈনিক যায় যায় দিন
১০-১০-২০১৩

নেরিকা ও নেরিকা মিউট্যান্ট ধান বীজের সংগ্রহ ও বিক্রয় মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ৩০-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৩-১৪ বর্ষে উৎপাদিত নেরিকা ও নেরিকা মিউট্যান্ট ধানবীজের সংগ্রহ মূল্য ও বিক্রয় মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

ক্রঃ নং	বীজের জাত	মৌসুম	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজি)
১	নেরিকা ও নেরিকা মিউট্যান্ট (কুদরত)	আউশ, আমন, বোরো	মানঘোষিত	৩১.০০ (একত্রিশ)	৩৬.০০ (ছত্রিশ)

আউশ ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৩-১৪ বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণি ও জতের আউশ ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

ক্রঃ নং	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১	সকল জাত	ভিত্তি	২৯.০০ (উনত্রিশ)
		প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত	২৬.০০ (ছাব্বিশ)

বিএডিসি'র ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার উন্মোচিত হয়েছে সেচ সম্প্রসারণের নতুন দুয়ার

এস,এ,এম জাহিদ আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক, ডাবল লিফটিং সেচ প্রকল্প

জীবনের জন্য পানি বিধাতার অপরিসীম আশীর্বাদ। মহাবিশ্বের সকল জীব জগতের প্রাণীই হোক আর উদ্ভিদই হোক জীবন ধারণের জন্য, জীবনের বেড়ে ওঠার জন্য পানি অপরিহার্য্য। বিধায় পানির আর এক নাম জীবন। বৃক্ষরাজী, লতা-গুল্ম, শস্য উদ্ভিদ সবকিছুই জীবন ধারণ, পুষ্টি গ্রহণ ও বৃদ্ধি সংঘটিত হয় পানি চক্রের মাধ্যমে। উদ্ভিদ মূলতঃ পানি গ্রহণের মাধ্যমেই পানিতে দ্রবীভূত প্রয়োজনীয় পুষ্টি শোষণ করে দৈহিক বৃদ্ধি লাভসহ ফুলে ফলে সুশোভিত হয়। তেমনই খাদ্য শষ্যের বৃদ্ধির জন্যও উদ্ভিদ সমূহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পানির মাধ্যমে মাটি হতে শোষণ করতে হয়। উদ্ভিদের জীবন ধারণ, পুষ্টি গ্রহণ ও শস্যদানা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পানি প্রকৃতিগতভাবেই পেয়ে থাকত। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা বৃদ্ধি হেতু অধিক পরিমাণ খাদ্য শস্যের উৎপাদন, শস্য পর্যায় পরিবর্তন ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে আজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল নয়। খাদ্যশস্য উৎপাদনে কৃষি প্রযুক্তি তথা সেচ ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন এক যুগান্তকারী সাফল্য। কৃষি সম্প্রসারণ, কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি, ফসলের নিবিড়তা সর্বোপরি উৎপাদন বৃদ্ধি মূলতঃ সেচ ব্যবস্থাপনা, সেচ দক্ষতা, সেচের কলাকৌশল, পানির গুণাগুন, সেচের পানির উৎস, যথাযথভাবে প্রয়োগ ও প্রয়োগের পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সেচের জন্য সাধারণতঃ দু'টি উৎসের পানি গ্রহণ করা হয়, যার একটি ভূগর্ভস্থ পানি এবং অপরটি ভূপরিস্থ পানি। ইতোপূর্বে সেচের পানির উৎস হিসাবে ভূপরিস্থ পানিই ট্রেডিশনাল পদ্ধতিতে ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের সেচের চাহিদা পূরণ করা হতো। কিন্তু তা চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা ও সময় বিবেচনায় অত্যন্ত অপ্রতুল হওয়ায় সেচের দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচের যান্ত্রিকীকরণ, কারিগরি কলাকৌশল প্রয়োগ, ক্ষেত্র তৈরি, গবেষণা প্রভৃতি কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), যা কৃষি ও কৃষকের আশীর্বাদের প্রতীক।

১৯৬১ সাল হতে বিএডিসি'র প্রকৌশলী, গবেষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও উদ্ভাবনী মেধা এবং কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সেচে এসেছে যুগান্তকারী সাফল্য। যুক্ত হয়েছে নতুন সেচ পদ্ধতি, উদ্ভাবিত হয়েছে নতুন প্রযুক্তির। তেমনই একটি প্রযুক্তি হলো, "ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম প্রযুক্তি।" এ প্রযুক্তি ব্যবহারে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর যেমন চাপ কমছে তেমনই ভূগর্ভের রিচার্জও বাড়ছে ফলে কমছে Ground Water deplation এ পদ্ধতিতে বড় বড় পাম্প ভাসমান পল্টুনের ওপর স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে এ সকল পাম্প পল্টুন বড় বড় নদী, হাওড়, বিল ও জলাশয়ে স্থাপন করা হয় যেখানে ভূপরিস্থ ব্যবহারযোগ্য অব্যবহৃত পানি মজুদ থাকে। সেসব অব্যবহৃত পানি পাম্প করে ফ্লেক্সিবল হোস পাইপ/এফআরপি পাইপের মাধ্যমে শুষ্ক খালে/পুনঃখননকৃত খালে সরবরাহ করা হয় যা পরবর্তীতে ছোট ছোট ফ্রাকশনাল পাম্পের মাধ্যমে ফসলের জমিতে সেচ কাজের জন্য সরবরাহ করা হয়। এতে যেমন মাঠে সেচের পানি সরবরাহের "লিড ও লিফট" বাড়ছে তেমনইভাবে সেচ খরচ (বিঘা প্রতি ৬০০-১২০০/-) পাশাপাশি Infiltration ও Perculation এর মাধ্যমে বাড়ছে Ground Water recharge দেশের পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ও মধ্য-পূর্ব এলাকা যেখানে হাওড় নামক ভূপরিস্থ পানির বিশাল জলাধার রয়েছে সেখানে এ প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে বিগত বছরের তুলনায় ২০১১-১২ অর্থবছরে ৪০% অধিক জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, ফলশ্রুতিতে ২৫% অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এ সকল পাম্প হাওড়/বিলে স্থাপন করায় জ্বালানী সমস্যার কারণে এ বছরে Duel Fuel (দ্বৈত জ্বালানী) প্রযুক্তির ব্যবহার সংযোজন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ প্রযুক্তির সাহায্যে ৩৫৪ টি ৫-কিউসেক (ল্যান্ড বেইজড), ৪ টি ১০-কিউসেক (Duel Fuel), ৫২টি ১২.৫-কিউসেক ও ১৮টি ২৫-কিউসেক পাম্পের মাধ্যমে দেশের ৩১টি জেলায় ৪০০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও পাহাড়ী এলাকার (কক্সবাজার) ঝরণার পানি/ছড়ার পানি যা শুস্ক মৌসুমে অবিরাম বয়ে যায় সাগরে, সে সকল ঝরণার পানি সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য সাবমার্জড ওয়্যার কাম ওয়াটার রেগুলেটর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে প্রাকৃতিকভাবে ছড়া/খালের Water stage বৃদ্ধি করে Gravity Flow এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রযুক্তিতে কোন পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে না।

আজ এ সকল প্রযুক্তি সেচ কাজে কৃষকের আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। বাড়ছে চাহিদা, বাড়ছে কৃষক ও জনপ্রতিনিধিদের চাপ।

সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা, যথাসময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিরবচ্ছিন্নকারণ ও লাগসই প্রযুক্তির অনুমোদনসহ প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় গ্রহণ করা হলে অদূর ভবিষ্যতে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তি হবে দেশের সেচ ব্যবস্থাপনার উজ্জলতর দৃষ্টান্ত, খুলে যাবে কৃষকের ভাগ্যের দুয়ার, ব্যবহৃত হবে অব্যবহৃত পরিত্যক্ত জমি, কৃষাণ-কৃষাণির মুখে থাকবে মায়াভরা অনাবিল হাসি, সোনার বাংলায় সোনা ফলবে রাশি রাশি।

কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে কুমিল্লা জেলায় বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রম

মুহাম্মদ বদরুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএডিসি, কুমিল্লা রিজিয়ন, কুমিল্লা

বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃক দেশ। এক সময়ে এই দেশে অনেক নদী, খাল ও বিল ছিল। যাতে প্রচুর ভূপরিস্থ পানির সংস্থান ছিল। অধিকাংশ নদীর উৎপত্তি স্থল ছিল পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে। এ সমস্ত নদী দিয়ে বর্ষা মৌসুমে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি এসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন খাল ও নদীর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সাগরে পতিত হতো। পানির সাথে পলি মাটি এসে ফসলী জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করাতে কম সার প্রয়োগ করে ভাল ফসল ফলানো সম্ভব হতো। তাছাড়া নদী পথে কম খরচে মালামাল পরিবহন করাও সম্ভব হতো। কালের বিবর্তনে এবং বিভিন্ন নদী ও খালের সংস্কারের অভাবে ধীরে ধীরে পলি জমার কারণে অধিকাংশ খাল ও নদীই আজ ভরাট হয়ে পানি শুন্য হয়ে পড়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সমস্ত নদী খাল চিহ্নিত করাই কঠিন হয়ে পড়ে। খাল বা নদী সমূহ ভরাট হওয়ার কারণে ভূপরিস্থ পানির স্বল্পতা সৃষ্টি হওয়ায় সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করতে হয়। সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নীচের দিকে চলে যাওয়ায় ভূগর্ভে সমুদ্রের লোনা পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দিন দিন বাংলাদেশের পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। যাতে ফসলের উপর বিরাট প্রভাব পড়ে। এই সমস্ত সমস্যা থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের পাশাপাশি রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে ভরাট হয়ে যাওয়া খাল পূনঃ খনন, সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য সেচ যন্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট ৮টি কার্যক্রম চালু আছে যার মধ্যে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা, নাঙ্গলকোট ও সদর দক্ষিন (অংশ) ও বরুড়া ও সদর দক্ষিন উপজেলার ৩টি কর্মসূচি জুন/২০১৩ সালে সমাপ্ত হবে। উক্ত ৩টি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রম সমূহের বর্ননা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

কুমিল্লায় ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ কর্তৃক খননকৃত খাল

১। কুমিল্লা জেলার ১৪ গ্রাম উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ উক্ত কর্মসূচির ৬৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি/১১ হতে জুন/১৩ইং পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়নাধীন। উক্ত কর্মসূচিতে মোট ৫৮ কিঃমিঃ খাল পূনঃ খনন, ৩৩ সেট এলএলপি ক্রয় ও ১১টি বিভিন্ন সেচ অবকাঠামো নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে জুন/১২ পর্যন্ত ৪৬ কিঃ মিঃ খাল ৩৩ সেট এলএলপি সংগ্রহ করা হয়। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ১৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২ কিঃ মিঃ খাল পূনঃ খনন ও ১১টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। যার বেশি ভাগ কাজই শেষ পর্যায়ে আছে। কর্মসূচিটির সফল সমাপ্তির পর কর্মসূচি এলাকায় প্রায় ১১০০ একর পতিত জমি চাষের আওতায় আসবে, তাতে প্রতি বৎসর ১১০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হবে।

২। কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট ও সদর দক্ষিন (অংশ) উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলা ও সদর দক্ষিণ উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে ৬২৮.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কর্মসূচিটি জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৩ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচীতে মোট ৫৮ কিঃ মিঃ খাল, ২৩টি এলএলপি সেট, ৫টি সেচনালা, ২৯টি বিভিন্ন ধরণের সেচ অবকাঠামো নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়। তন্মধ্যে জুন/১২ পর্যন্ত ৪৭ কিঃ মিঃ খাল পূনঃ খনন, ২৩টি এলএলপি ক্রয় ও ১৬টি বিভিন্ন সেচ অবকাঠামো নির্মাণ হয়।

কুমিল্লায় ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ কর্তৃক নির্মিত সেচনালা

(বাকী অংশ ১১ এর পাতায়)

২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৬৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১ কিঃ মিঃ খাল পূনঃ খনন ৫টি সেচ নালা নির্মান ও ১৩টি বিভিন্ন সেচ অবকাঠামো নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়। হাতে নেওয়া কাজ সমূহের ৭৫% কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ মে/১৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। কর্মসূচিটি সফল বাস্তবায়নের পর কর্মসূচি এলাকার ৮০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে, যাতে প্রতি বৎসর অতিরিক্ত ২০০০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হবে।

৩। কুমিল্লা জেলার বরুড়া ও সদর দক্ষিণ উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলা ও সদর দক্ষিন উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে ৫৯৮.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কর্মসূচিটি জানুয়ারি/১১ হতে জুন/১৩ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় ৫৩ কিঃ মিঃ খাল পূনঃ খনন, ৩১টি এলএলপি সেট, ২টি সেচনালা ও ৩৯টি বিভিন্ন ধরণের সেচ অবকাঠামো নির্মানের সংস্থান রাখা হয়। তন্মধ্যে জুন/১২ পর্যন্ত সময়ে ৩৩ কিঃ মিঃ খাল পূনঃ খনন, ২৯টি সেচ অবকাঠামো নির্মান করা হয়। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৭০.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০ কিঃ মিঃ খাল পূনঃ খনন ২টি সেচ নালা নির্মান ও ১০টি বিভিন্ন সেচ অবকাঠামো নির্মানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চলতি বৎসরের গৃহীত কার্যক্রমের প্রায় ৮০% কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ ৩০ মের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। কর্মসূচিটির সফল বাস্তবায়নের পর প্রতিবৎসর অতিরিক্ত ৮৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে, যাতে ২১২৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হবে।

কর্মসূচি সমূহ সফল বাস্তবায়নের পর একদিকে যেমন খাদ্য শষ্যের উৎপাদন বাড়বে, অন্য দিকে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যা হতে এলাকা কিছুটা উপকৃত হবে।

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে বীজ ডিলার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মুহাঃ আজহারুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক, মাবীসবৃ প্রকল্প, বিএডিসি, ঢাকা

ভাল বীজ ব্যবহার বৃদ্ধির প্রধান উপায় হচ্ছে বীজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং প্রচলিত বীজ বিধি-বিধান মেনে ভাল বীজ কৃষকের নিকট সরবরাহ করা। বীজ সরবরাহকারী সংগঠন এবং কৃষকদের মধ্যে বীজ ডিলারবৃন্দ সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন। বীজ ডিলারবৃন্দই মানসম্পন্ন বীজ কৃষকদের হাতে তুলে দেন। বীজের গুণাগুন জানার জন্য কৃষকরা তার এলাকায় বীজ ডিলারদের ওপর সব সময় নির্ভরশীল থাকেন। চাষীদের মাঝে যথাসময়ে ন্যায্য মূল্যে বীজ সরবরাহের কার্যে ডিলারগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। বিএডিসির বীজ বাজারজাতকরণ ও চাষীদের বীজের তথ্য সরবরাহের জন্য প্রায় ৭৫০০ জন বীজ ডিলারের সাহায্য নিয়ে থাকে।

বীজ ডিলাগণকে বীজ প্রযুক্তি ও বীজ বিধি-বিধান বিষয়ে সচেতন করার জন্য গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ সিলেট জেলায় সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলার ৫০ জন বীজ ডিলার এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ ইং তারিখে মৌলভীবাজার জেলায় মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলার ৫০ জন বীজ ডিলারের একদিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সরকারের বীজ বিধি-বিধান অনুযায়ী বীজ ডিলারের সংজ্ঞা, ডিলারের দায়িত্ব, দায়িত্ব পালন করতে না পারলে বীজ আইন মোতাবেক শাস্তির বিষয় ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এছাড়া বিএডিসি কর্তৃক যে সমস্ত ধান বীজ বিক্রয় করা হয় তার ছবি সহ বৈশিষ্ট্য বর্ননা করা হয়। আসন্ন বোরো মৌসুমে বীজ ডিলারদের মাধ্যমে যে সমস্ত বীজ বিক্রয় করা হবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পরে বীজ ডিলারবৃন্দ ধান বীজ গজানোর ক্ষমতা পরীক্ষণ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেন। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে বীজ ডিলারবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মান নিরুপনের জন্য সারাদিনের প্রশিক্ষণের ওপর ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে বীজ ডিলারবৃন্দের পরীক্ষা নেয়া হয়।

মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে সিলেট অঞ্চলের যুগ্মপরিচালক (বীজ বিপণন) এর ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ বিপণন) কৃষিবিদ মোঃ লুৎফুল করিম, বিএডিসি, ঢাকা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক, মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ঢাকা, যুগ্মপরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা), সিলেট এবং উপপরিচালক (বীজ বিপণন) সিলেটসহ বিএডিসির অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আগাম পাহাড়িয়া ঢল হতে বোরো ফসল রক্ষার জন্য মিছাখালি নদীতে রাবার ড্যাম

মোঃ হাফিজউল্লাহ চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক, রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি

আগাম পাহাড়িয়া ঢল হতে বোরো ফসল রক্ষার জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মিছাখালি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হচ্ছে। বিএডিসি কর্তৃক "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় মেনংছড়ায় একটি এবং সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় সোনাই নদীতে অপর একট রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে, যা বিগত বোরো মৌসুমে সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মিছাখালি নদীতে আরো একটি রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প মেয়াদ অনুযায়ী আগামী জুন/২০১৬ এর মধ্যে এটি সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্ধারণ করা আছে। মিছাখালি রাবার ড্যাম নির্মাণ সম্পন্ন হলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার আঙ্গুরালি হাওড় এলাকায় উজান থেকে নেমে আসা আগাম পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা থেকে প্রায় ৭,০০০ হেক্টর জমির বোরো ধান রক্ষা করা সম্ভব হবে। ফলে ৩১,৫০০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য রক্ষা পাবে, যার বাজার মূল্য ৫৬.৭০ কোটি টাকা।

সুনামগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা নিচু হওয়ায় শুধুমাত্র শুস্ক মৌসুমে একটি ফসল আবাদ করা হয়। আবার শুস্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা অপর্যাপ্ততার জন্যও অনেক এলাকার ভূমি পতিত পড়ে থাকে। জেলার হাওর এলাকাগুলোতে মূলত বোরো ফসল উৎপাদন করা যায়। বিস্তীর্ণ হাওর এলাকার প্রতি বছর উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় আগাম বন্যা হয়। আগাম বন্যার কারণে উঠতি বোরো ফসল পানিতে নিমজ্জিত ও নষ্ট হয়ে যায়। সুনামগঞ্জ জেলায় মোট ১১টি উপজেলা রয়েছে, যথা- সুনামগঞ্জ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ছাতক, দোয়ারাবাজার, জামালগঞ্জ, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, ধর্মপাশা, জগন্নাথপুর, দিরাই ও শাল্লা। উক্ত উপজেলাসমূহের মধ্যে বিশ্বম্ভরপুরসহ কয়েকটি উপজেলার পুরোটাই হাওর অঞ্চল হিসেবে পরিচিত।

হাওর এলাকা বিশেষত্ব

জুলাই থেকে নভেম্বর মাসে বন্যার কারণে হাওর এলাকায় গভীর পানি থাকে এবং সমুদ্রের মতো দেখায়। প্রচন্ড বাতাসে হাওরের ঢেউ ১.৫০ মিটার উচ্চতায় উঠে যায়। অপরদিকে শুকনো মৌসুমে হাওরের পানি নেমে যায় এবং জমিতে প্রচুর পরিমাণ পলি পড়ে। ফলে চাষের জমি উর্বর হয়, যা ধান চাষের জন্য উপযোগী। হাওর এলাকায় চৈত্র-বৈশাখ মাসে উজান থেকে (পার্শ্ববর্তী দেশের উৎস হতে) নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় বোরো ফসল পানিতে নিমজ্জিত ও নষ্ট হয়ে যায়। এতে স্থানীয় কৃষকদের প্রচুর ক্ষতি হয়। স্থানীয় কৃষকগণ আগাম বন্যা হতে উঠতি ফসল সংরক্ষণের জন্য নদীর মুখে প্রতি বছর মাটির বাঁধ নির্মাণ করে থাকে, যা ফসল কাটার পর ভেঙে ফেলে নদীর নাব্যতা বজায় রাখা হয়।

৩.০ হাওর এলাকার গৃহীতব্য কার্যক্রম

হাওর এলাকায় সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে বোরো ফসলের ক্ষতি রোধ করা যায় ঃ

ক) খাল নালা সংস্কার করে জলাধার তৈরি করে ফসলের প্রয়োজনে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা: এবং

খ) সেচ অবকাঠামো (যেমন রাবার ড্যাম ইত্যাদি) নির্মাণ করে আগাম বন্যা হতে বোরো ফসল রক্ষা করা।

৪.০ মিছাখালী রাবার ড্যাম

আঙ্গুরালি হাওর এলাকায় ফসল উৎপাদনে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিএডিসিসহ স্থানীয় কৃষকগণ বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাই আপাতত নতুন করে সেচ সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। তার বদলে পাহাড়িয়া ঢল হতে জমির ফসল রক্ষায় সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন। সে আলোকে এ সংস্থা কর্তৃক আগাম পাহাড়িয়া ঢল হতে বোরো ফসল রক্ষায় রাবার ড্যাম নির্মাণে উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়।

অবস্থান ঃ সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় দক্ষিণ বাদাঘাট ইউনিয়নের সিরাজপুর ও উলাসপুর মৌজার সংযোগস্থল মিছাখালী নদী। প্রস্তাবিত বাঁধের আপস্ট্রীমে মিছাখালী নদী ও ২০০ মিঃ ডাউন স্টীমের মিছাখালী নদী ও হামহামিয়া নদী।

মিছাখালী নদী ঃ

মিছাখালী নদী তাহিরপুর উপজেলার হাওর থেকে উৎপত্তি হয়ে পুরানগাঁ এর নিকট ভারতের মেঘালয় থেকে প্রবাহমান মনাই নদীর সাথে মিলিত হয়ে মিছাখালী নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এ ছাড়াও যদুকাটা নদী ইকরাটিয়া মৌজার নিকট মিছাখালী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। মিছাখালী নদী প্রস্তাবিত রাবার ড্যাম বাধ এলাকা অতিক্রম করে ২০০ মিঃ ডাউন স্টীমে প্রবাহিত হয়ে হামহামিয়া নদী ও মিছাখালী নদী

(বাকী অংশ ১৫ এর পাতায়)

কৃষি উন্নয়নে সরকারের সফলতা এবং বিএডিসি'র পুনর্গঠন

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক (বীপ্রস), বিএডিসি, ঢাকা

কৃষিক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সফলতা সবচেয়ে বেশি এবং তা দৃশ্যমান। এ ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য পদক্ষেপগুলির মধ্যে হচ্ছে ৪র্থ দফায় ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের দাম কমানো, ১ কোটি ৪৪ লক্ষ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ, কৃষিতে ভর্তুকির পরিমাণ ১২ হাজার কোটি টাকায় উন্নীতকরণ, ৪৫ হাজার ৭২২ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ, ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ, বিএডিসির মাধ্যমে গুণগতমান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ, বীজ হিমাগারের ধারণক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিটি দুই হাজার টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৫টি নতুন বীজ হিমাগার নির্মানাধীন, পটুয়াখালী জেলার দশমিনায় দেশের সর্ববৃহৎ বীজ উৎপাদন খামার প্রতিষ্ঠা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে প্রথম পাটের জীবন রহস্য উম্মোচন এবং জি এম ফসল (জিনেটিকালী মোডিফাইড ক্রপ) উদ্ভাবন, সার্ক সীড ব্যাংক গঠন, প্রাইভেট বীজ কোম্পানীর মাধ্যমে প্রথমবারের মত বিদেশে হাইব্রিড ধানের বীজ রফতানি প্রভৃতি। এসব কাজের দ্বারা প্রমাণিত হয় বর্তমান সরকার একটি কৃষি বান্ধব সরকার।

কৃষি উন্নয়নে সরকারের আন্তরিকতার আর একটি উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর পূর্নগঠন বা বিএডিসি'র বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের লক্ষ্যে কমিটি গঠন। কিন্তু এ সংক্রান্ত অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর হওয়ায় সংশিষ্ট সকলের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে এ সরকারের আমলে আদৌ বিএডিসি পূর্নগঠন হবে কি না। এখানে বিএডিসির অতীত কর্মকান্ড নিয়ে একটু পিছনের দিকে যাওয়া দরকার যদিও প্রতিষ্ঠানটির অবদান কমবেশি সকলের কাছে স্পষ্ট। ১৯৬১ সালে যে ম্যান্ডেট নিয়ে বিএডিসির কার্যক্রম শুরু হয় তা ধীরে ধীরে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকান্ডের স্ফীতি ঘটে অন্যদিকে জনবলের পরিমানও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিএডিসি'র কাজ হচ্ছে কৃষক পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা যা প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষি উপকরণ বলতে এখানে বীজ, সার ও সেচকে বুঝানো হচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্টির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিগত ৫০ বছর যাবত কৃষি উন্নয়নে স্মারণযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। গবেষণা ও সম্প্রসারণ নিষ্ফল হবে যদি কৃষক পর্যায়ে সময়মত পর্যাপ্ত ও মান সম্পন্ন কৃষি উপকরণ না থাকে। কৃষিনির্ভর আমাদের অর্থনীতিকে বাঁচাতে কৃষকদেরকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে যা এ সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে মনে হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিএডিসি'র কর্মরত জনবল ছিল প্রায় ৪৮,০০০। কিন্তু ১৯৮৩-১৯৮৪ সালে গঠিত এনাম কমিশনের সুপারিশে নতুন নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, ফলে জনবলের সংখ্যা কমতে থাকে। ১৯৯৬ সালে বিএডিসি'র কর্মরত জনবলের সংখ্যা কমে ২৬,৩৯২ এ দাঁড়ায়। এক দিকে নতুন নিয়োগ বন্ধ অন্যদিকে স্বেচ্ছাবসর এবং স্বাভাবিক অবসরের কারণে প্রতিবছর ক্রমান্বয়ে জনবল কমতে থাকে। ১৯৯৯ সালে পুনর্গঠনের পর জনবল ৬,৮০০ তে নামিয়ে আনা হয়। বিভিন্ন সময়ে জনবল ক্রমাগতভাবে হ্রাস করা হলেও বিএডিসির কর্মকান্ড সে অনুপাতে হ্রাস না করে বরং বৃদ্ধিই করা হয়েছে। যাই হোক পুনর্গঠন সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাবে বিএডিসি'র জনবল ধরা হয়েছে ১০,১০০ জন। বিএডিসি ১৯৭২ সালে সেচ কাজে পানি সরবরাহের জন্য মাঠ পর্যায়ে অগভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ শুরু করে এবং এক পর্যায়ে হ্রাসকৃত মূল্যে অগভীর নলকূপ বিক্রির কার্যক্রমও হাতে নেয়। সেচ কাজে এটি একটি অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকলে ১৯৭৯-৮০ সালে অগভীর নলকূপ হতে ভর্তুকি প্রত্যাহার করা হয়। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ১,৫০,০০০ টি অগভীর নলকূপ বিক্রি/সরবরাহের কাজ সম্পন্ন করেছে। '৯০ এর দশকের পর বিএডিসিকে অগভীর নলকূপ বিক্রির সকল কার্যক্রম থেকে প্রত্যাহার করা হয়।

যাইহোক বর্তমানে ক্ষুদ্রসেচ উইং এর আওতায় ৬৪টি প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান রয়েছে। বিগত সময়ে অপরিণামদর্শী কিছু সিদ্ধান্তের ফলে ও দাতা দেশ সমূহের চাপের মুখে বৃহৎ এ প্রতিষ্ঠানটিকে কাটছাট করে জনবল কমিয়ে আনা হয়। বীজ বিক্রয় কেন্দ্রসমূহ সংকুচিত করা হয়, সারের উপর থেকে ভর্তুকি সম্পূর্ণরুপে প্রত্যাহার করে রাসায়নিক সার সরবরাহের দায়িত্ব বিসিআইসি'র হাতে অর্পন করা হয়। এর পরিণাম যে খুব একটা সুখকর হয়নি তা আর কারও অজানা নাই। এ দেশের দরিদ্র কৃষক সমাজকে এর জন্য অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। বীজ বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়ে আনা ও রাসায়নিক সার বিশেষ করে ইউরিয়া সার সরবরাহের দায়িত্ব বিসিআইসি'র হাতে অর্পণ করায় গুরুত্বপূর্ণ এ কৃষি উপকরণ দুটির সহজলভ্যতা কমে যায়। পরবর্তিতে সরকার এ কৃষির সংগে সংশিষ্ট সকলেই উপলব্ধি করে যে বিএডিসিকে সংকৃচিত করা কোন ভাবেই সঠিক হয় নি। সারের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত ৬টি বিভাগে ৬টি সার পরীক্ষাগার মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট (এসআরডিআই) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট এর নিকট হস্থান্তরের ফলে ঐ সার পরীক্ষাগারগুলিতে কিভাবে কাজ হচ্ছে বা যে লক্ষ্যে বিএডিসি'র নিকট থেকে হস্তান্তর করা হয় তা পূরণ হচ্ছে কি না দেখা দরকার। তা না হলে পুনরায় বিএডিসি'র নিকট ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বিএডিসির বীজ, সার ও সেচ কার্যক্রম পুনজীবিত করায় হাত দেন।

(বাকী অংশ ১৪ এর পাতায়)

কৃষি উন্নয়নে সরকারের সফলতা

(১৩ পাতা এর পর)

২০০৯-১০ সালে বিএডিসি কর্তৃক নন-ইউরিয়া সার বিতরণ এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৩.০০ লক্ষ মে. টন যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ সালে ৫.৫ মে. টন এ দাড়ায়। বিগত বছরগুলোর বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরনের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নেয়া হলেও বর্তমান জনবল দিয়েই তা চালিয়ে নেয়া হচ্ছে, ফলে একদিকে জনবলের স্বল্পতা ও অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান লক্ষমাত্রা অর্জন প্রতিষ্ঠানটির জন্য রীতিমত একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। বর্তমানে বিএডিসির রয়েছে ৩২টি বীজ বর্ধন খামার, ৬২টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোন, ৫২টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্র, ২২টি আঞ্চলিক বীজ বিক্রয় কেন্দ্র, ৪২টি জেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র, ৩৬টি উপজেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র অর্থাৎ মেট ১০০টি বীজ বিক্রয় কেন্দ্র ও ৭,৫১৫ জন বীজ ডিলার সমন্বয়ে গঠিত সুবিন্যস্থ বিপণন নেটওয়ার্ক। আলু বীজ বিতরণের জন্য রয়েছে ১৭ টি আলু বীজ উৎপাদন জোন এবং প্রতিটিতে রয়েছে একটি করে হিমাগার। বর্তমানে ডোমার বীজ আলু উৎপাদন খামারে ২টি, কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে ১টি ও রাজশাহী উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে ১টি করে মোট ৪টি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাইরাস মুক্ত মৌল বীজ আলু তৈরি করা হচ্ছে ফলে বিদেশ থেকে বিশেষ করে নেদারল্যান্ড থেকে বীজ আলু আমদানিকে নিরুৎসাহিত করা হবে। এছাড়াও শাক সবজী, ফলমূল ও এসবের চারা উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে ১৩টি এএসসি (এগ্রো সার্ভিস সেন্টার) ও ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র। বিদেশে রপ্তনীযোগ্য ফল ও সবজির জন্য ১২০টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি হিমাগার রয়েছে। বর্তমানে দেশে একদিকে যেমন ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে কৃষি জমির পরিমানও হ্রাস পাচ্ছে। বর্ধিত এই জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুনগত মান সম্পন্ন কৃষি উপকরণ বিশেষ করে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাল বীজ ও সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের নিকট মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ কার্যক্রমে বিএডিসি বিগত ২০০৮-০৯ মৌসুমে ৯০,৯২৮ মে. টন, ২০০৯-১০ মৌসুমে ১,০৩,৫৭২ মে. টন, ২০১০-১১ মৌসুমে ১,২৮,৪৯১ মে. টন ও ২০১১-১২ মৌসুমে ১,৪৪,৪৭১ মে. টন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছে। বর্তমান সরকারে আমলে অদ্যাবধি (৪ বছরে) মোট ৪,৬৭,৪৬২ মে. টন বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছে যা পূর্ববর্তী ৫ বছরের চেয়ে ২,৪৩,৪২৩ মে. টন বেশি। ২০২০ সালের মধ্যে বিএডিসি কর্তৃক ২,৪৫,৩০০ মে. টন উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ, পুষ্টি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে উলেখিত পরিমান বীজও যথেষ্ট নয়। পর্যাপ্ত বীজের চাহিদা পূরণে তাই এক্ষুণি দরকার একটি শক্তিশালী ও পুনর্গঠিত বিএডিসি। খামারের জমির পরিমান বৃদ্ধি, চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এবং অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা সম্ভব না। আর এ সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়নে এক দিকে যেমন অবশ্যই নতুন নতুন খামার, চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের সংখ্যা বৃদ্ধি, যানবাহন ও অন্যান্য অবকাঠামো বৃদ্ধি করতে হবে অন্যদিকে বর্ধিত লক্ষমাত্রা পূরণে আনুপাতিক হারে নতুন জনবল অবশ্যই নিয়োগ দিতে হবে। প্রয়োজনে কম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর থেকে বাজেট কমিয়ে তা দিয়ে বিএডিসি'র নতুন জনবল নিয়োগে প্রাধান্য দিতে হবে। জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ০২/০৮/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪তম সভায় বিএডিসি পুনগঠন বিষয়টি সম্পর্কে কৃষি মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়। এ সুপারিশের আলোকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং কৃষি/উপ-১/বিবিধ-২/২০০৯/৪৭০ তারিখ ০২/১১/২০০৯ মূলে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সাবেক কৃষি সচিব ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. এ, এম, এম, শওকত আলীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মান্নান আকন্দ ও সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ শহিদউলাহ তালুকদার এর মত কৃষি বিশেষজ্ঞরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কমিটির সদস্যগণ বিএডিসি'র কার্যক্রমরে সাথে জড়িত বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর প্রধান বা মনোনিত ব্যক্তিবর্গ এবং বিএডিসির প্রাক্তন কর্মকর্তা যারা বিশেষজ্ঞ হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তারা এবং বিএডিসিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে আলোচনা ও মত বিনিময় করেন এবং বিদ্যমান সমস্যা পর্যালোচনা করে তা দূর করা লক্ষ্যে ২০১০ এর মাঝামাঝি সময় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করে। কিন্তু অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক হচ্ছে প্রতিবেদন দাখিলের প্রায় সাড়ে তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও এখন পর্যন্ত বিএডিসি পুনর্গঠন আলোর মুখ দেখেনি। জানা গেছে, বিএডিসি পুনর্গঠন নিয়ে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে বিএডিসি পুনর্গঠন যাতে দ্রুত বাস্তবায়ন ঘটে সেদিকে সরকারকে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

আগাম পাহাড়িয়া ঢল হতে বোরো ফসল রক্ষার জন্য

(১২ পাতা এর পর)

এলাকার কৃষি পরিস্থিতি ঃ

প্রস্তাবিত রাবার ড্যামের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ফসলি জমি, যার অধিকাংশই হাওর এলাকাভূক্ত। বর্ষাকালে এ এলাকার কিছু কিছু জমিতে আমন ধানের চাষাবাদ হলেও হাওরের অধিকাংশ জমি পানিতে নিমজ্জিত থাকায় আমন মৌসুমে জমিগুলি পতিত থাকে। বর্ষা পরবর্তী রবি মৌসুমে জমিগুলো শুকিয়ে গেলে সমগ্র এলাকাজুড়ে বোরো ধানের চাষাবাদ করা হয়। স্থানীয় নদীগুলোতে পানি প্রবাহ থাকায় সেচের পানির কোন অভাব হয় না। এ এলাকায় প্রায় ৭,০০০ হেক্টর জমিতে বোরো ফসল আবাদ করা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ঃ

ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে সেচের উৎস তৈরি করার জন্য মাটির বাঁধ, রাবার ড্যাম বা Retension Structure নির্মাণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে সেচের পানির উৎস তৈরির প্রয়োজন না থাকলেও মাঠের উঠতি বোরো ফসল আগাম বন্যা থেকে রক্ষা করার জন্য বাঁধ নির্মাণ করা জরুরি। স্থানীয়ভাবে মাটির বাঁধ নির্মাণ করা হলেও তা সবসময় Stable হয় না এবং পাহাড়িয়া ঢলের পানি প্রতিরোধ করতে পারে না। বিগত ২০০৯ এবং ২০১০ সনের শুকনো মৌসুমে আকস্মিক পাহাড়িয়া ঢলে হাওর এলাকার প্রায় সকল ফসল নষ্ট হয়ে যায়, ফলে এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এ অবস্থা উত্তরণে সরকার কর্তৃক পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু করে কৃষকদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই এ নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

আগাম বন্যা হতে উঠতি বোরো ফসল রক্ষা করার জন্য প্রতি বছর ২২ থেকে ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৭৫ মিটার লম্বা, ৪ মিটার প্রস্থ ও ৩ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট মাটির বাঁধ পানি উন্নয়ন বোর্ড/ উপজেলা প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক নির্মাণ করা হয়। ফসল কাটার পর নদীর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য নির্মাণকৃত মাটির বাঁধটি ভেঙ্গে দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে বর্ষাকালে পাথরের নৌকা ও ট্রলার চলাচলে কোন অসুবিধা হয় না। নদী ও আশেপাশের এলাকার মাটির বুনট বালু জাতীয় হওয়ায় প্রায়শ বন্যার প্রবল বেগে বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং ৭,০০০ হেক্টর এলাকার আনুমানিক ৩১,৫০০ মেট্রিক টন বোরো ধান বিনষ্ট হয় যার আনুমানিক মূল্য ৫৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক মিছাখালী নদীতে পাঁচ স্প্যান বিশিষ্ট ২৪০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪.৫ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন রাবার ড্যাম (Water Retention Structure) নির্মাণ করার বিষয়ে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। জরিপ, মাটি পরীক্ষা, সাইট সিলেকশন ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। বর্ণিত সাইটে রাবার ড্যাম নির্মাণে আনুমানিক ৩৭-৩৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

৫.০ বিএডিসি রাবার ড্যাম এর সাথে সম্পৃক্ততা

১৯৫০ দশকের পূর্বভাগে রাবার ড্যাম প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন করা হয়। এটি একটি চীনা প্রযুক্তি। রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচ প্রদান, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূগর্ভস্থ একুইফার রিচার্জ, লবণাক্ত পানি ঢোকায় বাধা, টাইডাল বন্যা হতে তীরবর্তী এলাকা রক্ষা করা হয়। ১৯৯৫ সনে এলজিইডি বাংলাদেশে প্রথম রাবার ড্যাম নির্মাণ করে। পরে পানি উন্নয়ন বোর্ড সম্পৃক্ত হয়। বিএডিসি ২০০৯ সনে এ প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং **'খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প'** এর আওতায় দুইটি রাবার ড্যাম নির্মাণের দায়িত্ব পায়। প্রকল্প মেয়াদ জুন/২০১৪ পর্যন্ত থাকলেও বিএডিসি দুই বছর পূর্বে রাবার ড্যাম দুইটি বাস্তবায়ন করে। বিগত বোরো মৌসুমে রাবার ড্যাম দুইটি ব্যবহৃত হয়েছে। গত আগস্ট/২০১২ মাসে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত আলোচ্য প্রকল্পের ১ম সংশোধন মতে বিএডিসি আরো একটি রাবার ড্যাম নির্মাণের দায়িত্ব পায়, যা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাবার ড্যাম। এটি সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মিছাখালি নদীতে নির্মাণ করা হয় হবে। এর মেয়াদ আগামী জুন/২০১৬ পর্যন্ত।

অপরদিকে গত ১৫মে ২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বিএডিসিকে আরো দুইটি রাবার ড্যাম নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয়। **"জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় রাবার ড্যাম নির্মাণে মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলার" রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পারুয়া ইউনিয়নে ইছামতি নদীর উপর ৬২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪.৫০ মিটার উচ্চতা এবং পদুয়া ইউনিয়নে শিলক খালের উপর ৪০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪.৫০ মিচার উচ্চতা বিশিষ্ট দুটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হচ্ছে। রাবার ড্যাম দুটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং সেচ কার্যক্রমে ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে। এতে পাহাড়িয়া উপজেলা রাঙ্গুনিয়ার অতিরিক্ত ১৫০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে।

ফলশ্রুতিতে প্রকল্প এলাকায় ৬৭৫০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে। বর্তমানে রাঙ্গুনিয়ার দুইটি রাবার ড্যামে জাপান থেকে স্টীল শীট পাইল আনয়ন ও ১০০% ড্রাইভিং সম্পন্ন হয়েছে। ড্যাম অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ প্রায় ৯০% অগ্রগতি হয়েছে। অপরদিকে চীন থেকে দুইটি রাবার ব্যাগ আনয়ন করে পদুয়ার শিলক খালে একটি এ্যাংকরিং সম্পন্ন হয়েছে। পানি কমার পর ইছামতি নদীতে অপর রাবার ব্যাগটি এ্যাংকরিং করা হবে। রাঙ্গুনিয়া রাবার ড্যাম প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ স্বল্প সময়ে দ্রুততার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৬.০ উপসংহার

পরিবেশ বান্ধব রাবার ড্যাম প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এধরনের সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দেশে সেচ সুবিধা প্রদান, খাদ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের কৃষি

অগ্রহায়ণ ঃ নবান্নের মৌ মৌ গন্ধে আর পিঠা পায়েসের সমারোহে অগ্রহায়ণের আগমন। এ সময় কৃষকের কাজের অন্ত নেই।

আমন ধান ঃ আমন ধান কাটার ভরা মৌসুম। আমন ধান কেটে স্তুপ করে না রেখে মাড়াই করে ফেলতে হবে। গরু দিয়ে মাড়াই না করে কাঠ বা ড্রামের উপর ধানের আঁটি পিটিয়ে মাড়াই করা ভাল। ইদানিং প্যাডন থ্রেসার দিয়ে মাড়াই কাজ অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। যন্ত্রটির দাম কম, সহজে বহনযোগ্য এবং কার্যক্ষমতাও ভাল। মাড়াই করা ধান ভাল করে শুকিয়ে পরিস্কার করে তারপর গোলাজাত করতে হবে। বীজ ধানের ক্ষেত্রে ফুল আসার সময় এবং ধান কাটার আগে যে জাতের ধান লাগানো হয়েছে তা থেকে ভিন্ন জাতের বিজাত তথা খাটো-লম্বা, আগে পরে ফুল আসা, রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। বীজের ক্ষেত্রে মাড়াই ঝাড়াই শুকানো সকল কাজ আলাদাভাবে করতে হবে। বীজ ধান দাঁত দিয়ে কামড় দিলে কট শব্দ হয় এমনভাবে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

বোরো ধান ঃ বোরো ধানে বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময় এখন। বীজতলা সাধারণত কম উর্বর জমিতে করা হয়ে থাকে। এটা কখনো করা যাবে না। বরং উর্বর একটু উচু জমিতে প্রয়োজন মত জৈব সার দিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হবে। শীতে চারার বাড়ন্ত কমে গেলে ভোরে ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে পাবন সেচ দিলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। জমির উর্বরতা ও চারার বাড়ন্ত অবস্থা অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে হবে।

গম ঃ এ মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে গম বীজ বপন করতে পারলে ভাল হয়। এর পরে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য গমের ফলন হেক্টরে প্রতি ৫ কেজি কমে যেতে পারে। গম চাষের জন্য জমি উত্তমরূপে চাষ করে একর প্রতি ৭০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি টিএসপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার নিয়মমাফিক প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রভোক্স বা অন্য ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজশোধন করে নিলে বীজ ও চারা গাছ রোগ বালাইয়ের আক্রমন থেকে রক্ষা পায়। সেচসহ হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি এবং সেচ ছাড়া ১০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

আলু ঃ এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে আলু লাগানো শেষ করতে হবে। উত্তম রূপে জমি প্রস্তুত করে সারি করে আলু লাগাতে হবে। প্রতি একর জমিতে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। প্রতি একরে ১২০ ঃ ১২০ ঃ ১৪০ কেজি হারে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমও পি এবং ২৪০ কেজি খৈল সার দিতে হবে।

শীতকালীন সব্জী ঃ ইতিপূর্বে লাগানো ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, মুলা, লেটুস, শালগম, গাজর ফসলের প্রতিটি গাছ আলাদাভাবে যত্ন নিতে হবে। এ সকল সব্জীর বীজ ও চারা লাগানো এ মাসেও অব্যাহত থাকে।

ডাল ও তৈল বীজ ঃ ইতোমধ্যে স্বল্পকালীন সরিষাজাতে ফুল ধরা শুরু হয়েছে। সরিষার মাঠে মৌবক্স ব্যবহার করলে সরিষার ফলন বৃদ্ধি পাবে। মসুর, ছোলা, খেসারী মটর ফসল মাঠে বাড়ন্ত অবস্থায় থাকে। এসব ফসলে খুব একটা পোকামাকড় হয় না। রোগবালাই দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে। সয়াবীন ও বাদাম বীজবপন এ সময় শুরু করতে হবে।

পৌষ মাস ঃ এ মাস হতে বোরো ধান লাগানো শুরু করা যায়। চারা উঠানোর ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যাতে শেকড় ছিড়ে না যায়। ২/১ টি সুস্থ সবল চাড়া লাইনে লাগাতে হবে। সব চারা না বাচলে শুন্যস্থান পুরণ করতে হবে। জমির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে পরিমাণমত সার সুপারিশ মাফিক প্রয়োগ করতে হবে।

গম ঃ গমের বাড়ন্ত অবস্থায় ফুল আসার আগে একবার হালকা সেচ দিলে ফলন অনেক বেড়ে যায়। সাধারণত গম ক্ষেতে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হয় না।

আলু ঃ আলু ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। আলুর আগাম ধ্বসা রোগ খুবই মারাত্মক এবং এতে আলুর ফলন শতভাগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্নসহ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হলে আলুর এ মড়ক রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ রোগ আক্রমণের প্রথম অবস্থায় গাছের পাতার উপরে ফ্যাকাশে দাগ পড়ে। পরে এ দাগের সংরক্ষণ ও বিস্তার দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ২/৩ দিনে সম্পূর্ণ গাছকে পঁচিয়ে ফেলে। এ রোগের প্রতিষেধক রূপে রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে প্রতি তিন দিন অন্তর ডাইথেন -৪৫ বা অন্য অনুমোদিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

ডাল তৈল ঃ সরিষা ফসলে (দীর্ঘ মেয়াদীজাত) হালকা সেচ দিতে হবে। সরিষার জাব পোকা দেখা দিলে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। বৃহত্তর বরিশাল পটুয়াখালী অঞ্চলে এসময় মুগ বীজ বপন শুরু করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে ডাল ফসলের জমিতে হালকা সেচ দিতে হবে।

অন্যান্য ফসল ঃ এসময় বৃষ্টিপাত হয়না বলে সব্জী ও মসলা ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে। এ মাসেই পটলের লতা লাগানো যেতে পারে।

ভাল বীজে ভাল ফসল

ধান চাষের "ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তি" গবেষণার সারসংক্ষেপ

কৃষিবিদ মোঃ আরিফ হোসেন খান
যুগ্ম পরিচালক (বীজ বিপণন) বিএডিসি, রাজশাহী

গবেষণার সুত্রপাত ঃ ২০০৮ সালে চ্যানেন আই থেকে প্রচারিত "হৃদয়ে মাটি ও মানুষ" অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ শাইখ সিরাজ টাঙ্গাইলের চাষি জনাব মোঃ আব্দুল আজিজের বিঘাতে ২/৩ কেজি (শতকরা ১০%) ইউরিয়া সার স্প্রে করে ধান চাষের বিষয়টি উপস্থাপন করেলে সে সময়ে এ বিষয়ে দেশে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা করে দেখেন যে এত অল্প পরিমাণ ইউরিয়া স্প্রে এর মাধ্যমে প্রয়োগ করে ধান চাষে কাঙ্খিত ফলন পাওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আমিও সম্পূর্ণ একমত যে এত অল্প পরিমাণ ইউরিয়া সার স্প্রে এর মাধ্যমে প্রয়োগ করে সকল জমি থেকে লাভজনক ভাবে ধান চাষ করা সম্ভব নয়। মূলত চাষি জনাব মোঃ আব্দুল আজিজের ধান চাষে ইউরিয়া স্প্রে করার সূত্র ধরেই দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে ধান চাষের "ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তিটি" উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছি। ধান চাষে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি কেন এত বেশি কার্যকর হচ্ছে এবং ধান চাষে ইউরিয়া সারের ব্যবহার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ কমে যাচ্ছে পক্ষান্তরে ধানের ফলন উলেখযোগ্য ভাবে বেশি হচ্ছে তা এ লেখার মাধ্যমে খুব সংক্ষেপে উপস্থাপন করলাম। আশা করি সূধী পাঠকবৃন্দ সংক্ষিপ্ত লেখাটি পড়লে খুব সহজে প্রযুক্তিটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বুঝতে পারবেন এবং প্রযুক্তিটি যে কার্যকর সে বিষয়ে একমত হবেন। তবে ধান চাষের ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তি ব্যবহারের অন্যান্য সুবিধা যেমন, ১) তীব্র শীতে বোরো ধানের চারা কোল্ড ইনজুরীতে আক্রান্ত না হওয়া, ২) খরার সময় ভালো ভাবে ধান উৎপাদন করতে পারা এবং ৩) লবনাক্ত মাটিতে অধিক ধান উৎপাদনের ফলন বৃদ্ধির বিষয়টিই উপস্থাপন করা হলো। সাম্প্রতিক সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের Governance Innovation Unit (GIU) থেকে আমার এই উদ্ভাবনটিকে জাতীয় অতিগুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হিসাবে উলেখ করা হয়েছে। এজন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ঃ আমরা সাধারণত মুখ দিয়েই আমাদের খাদ্য/পুষ্টি গ্রহণ করে থাকি কিন্তু কোন কারণে যখন মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করতে পারিনা তখন ভেইনের মাধ্যমে আমাদেরকে পুষ্টি সরবরাহ করে (বহুল প্রচলিত স্যালাইনের মাধ্যমে) দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। বিষয়টি আমরা প্রতিনিয়তই ক্লিনিক বা হাসপাতালে দেখছি। গাছ সাধারণত মাটি থেকে শিকড়ের মাধ্যমেই তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে থাকে। তবে কোন কারণে গাছ শিকড়ের মাধ্যমে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে সে ক্ষেত্রে পাতার মাধ্যমে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে গাছকেও মানুষের মত দ্রুত সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা যায়। গাছের ক্ষেত্রে খাদ্য প্রদানের এই কৌশলটিকে Feeding/Foliar Fertilization Technology বলা হয়। গাছকে খাদ্য প্রদানের এই প্রযুক্তিটি আমেরিকাতে ১৮৪৪ সালে প্রথম প্রয়োগ করা হলেও ফসল উৎপাদনের এটি যে একটি কার্যকর প্রযুক্তি তা ১৯৫০ সালে আমেরিকার মিসিগান স্টেট ইউনিভারসিটির উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের Dr. H. B Tukey এবং S.H. Wittwer নাম দুই জন বিজ্ঞানী সুনিদিষ্ট ভাবে প্রমাণ করেণ।

উন্নত বিশ্বের অবস্থান ঃ উন্নতবিশ্ব এই Foliar Feeing প্রযুক্তিটিকে ফসল উপাদনের (ভুট্টা, গম, উদ্যান ফসল, সব্জি ফসল ইত্যাদি) কাজে সুসংহত ভাবে ব্যবহার করে রাসায়নিক সার বিশেষ করে ইউরিয়ার ব্যবহার কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও এই Foliar Feeding প্রযুক্তিটি ব্যবহারে অনেক, এগিয়ে গিয়েছে। বর্তমান সময়ে ইউরিয়া সার পাতার মাধ্যমে স্প্রে করে প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে ভারতের চাষিদেরকে অবহিত করা হচ্ছে যা আমরা অনেকেই দেখেছি।কিন্তু আমাদের দেশে ফসল উৎপাদন কাজে এই প্রযুক্তিটিকে তেমন সুসংহত ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

(বাকী অংশ ৫৬ এর পাতায়)

ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তি প্রয়োগকৃত পট

কন্ট্রোল পট

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি'র সভায় সভাপতিত্ব করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের প্রকল্প পরিচালকদের সাথে মত বিনিময় করছেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আবদুস সামাদ

বীজ বিতরণ বিভাগের সভায় সভাপতিত্ব করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

খাদ্য মেলায় বিএডিসি'র স্টলে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি, সদস্য পরিচালকবৃন্দ, সচিব মহোদয়সহ অন্যান্যদেরকে দেখা যাচ্ছে

বিএডিসি এসিস্ট্যান্ট পার্সোনাল অফিসার্স এসোসিয়েশনের দ্বি-পাক্ষিক সম্মেলন ২০১৩ তে বক্তব্য রাখছেন সিবিএ সাধারণ সম্পাদক জনাব জান মোহাম্মদ

কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এর রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

খাদ্য মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

খাদ্য মেলা ২০১৩ তে পুরস্কারের ক্রেস্টটি বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি কে হস্তান্তর করা হচ্ছে

চিত্রে বিএডিসি

খাদ্য মেলায় বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত গাছ আলু

খাদ্য মেলায় বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত ড্রাগন ফল

প্রদর্শনীতে বিএডিসি'র আমদানিকৃত সারের নমুনা

খাদ্য মেলায় বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত সোনাই নদী রাবার ড্যামের মডেল

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ বর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।